৯
প্রা ক্ ক থা

১৩
আমাদের ইতিহাস? না ওদের ইতিহাস?

১২৩
উত্তরকথা
এনসিইআরটি ও ভারতীয় ইতিহাসের ‘যুক্তিবিধান’

১৩৯
পাঠ

প্র কা শ ক থা

প্রতিক্ষণ প্রকাশিত রোমিলা থাপারের দ্বিতীয় বই এটি। প্রথম বইটি, *বিরুদ্ধতার স্বর*, প্রকাশকালে প্রতিক্ষণ-এ আয়োজিত এক আলোচনায় অধ্যাপক থাপার আমাদের একটি বিষয়ে বিপদসংকেত দিয়েছিলেন। তা ছিল *আমাদের ইতিহাস*-কে দুমড়ে মুচড়ে গৈরিক আধিপত্যবাদীদের *ওদের ইতিহাস*-এ বদলে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়ে। অধ্যাপক রোমিলা থাপার তার আগে থেকেই ইতিহাস নিয়ে এই ইতিহাসবিরুদ্ধ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সবাক ছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রক্রিয়ারই ফসল এই বইটি। আজকের আবহে এই বক্তব্যগুলি জরুরি ছিল। আমরা বইটির প্রকাশকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে দেখেছি।

নবতিপর, ঋজু-চিন্তক এই ইতিহাসবিদ তাঁর আগের বইটির মতোই এটিতেও কিছু বিতর্কের অবকাশ রেখে দিয়েছেন। সব প্রশ্নেই সব পাঠক একমত থাকবেন, এমন একরৈখিক চিন্তা তাঁর, বা প্রকাশক হিসেবে আমাদের, মোটেই নেই। মূল বক্তব্যটি যথাসম্ভব বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক রোমিলা থাপার চেয়েছিলেন, *বিরুদ্ধতার স্বর*-এর অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে ক-জন ছিলেন, তাঁরাই দ্বিতীয় বইয়ের কাজটি করুন। প্রত্যেককে যুক্ত না করতে পারলেও মূলত তাঁদের হাতেই *আমাদের ইতিহাস? না ওদের ইতিহাস?* নির্মিত হল।

নির্বাহী সম্পাদক, **প্রতিক্ষণ**
জানুয়ারি, ২০২৪

প্রা ক্ ক থা

২০২৩ সালের ১৪ জানুয়ারি আমি নয়া দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে *ড. সি ডি দেশমুখ স্মারক বক্তৃতা* দিই। এই আলোচনাটি তারই সম্প্রসারিত চেহারা। মূল বক্তৃতাটি *আইআইসি কোয়ার্টারলি* পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

আইআইসি-র অধিকর্তা বক্তৃতাটিকে এই অতিসম্প্রসারিত চেহারায় আলাদাভাবে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। *এনসিইআরটি ও ভারতীয় ইতিহাসের 'যুক্তিবিধান'* শীর্ষক নিবন্ধটি এই বইয়ের উত্তরকথন হিসেবে পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। সে বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার জন্য *দি ওয়্যার*-কেও ধন্যবাদ।

আমার কয়েকজন বন্ধু বক্তৃতার প্রাথমিক খসড়াটি পড়ে সে বিষয়ে মন্তব্য করার ঝক্কি ঘাড়ে নিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। আর মুজফ্‌ফর আলম ও শিরিষ প্যাটেল এই অতিসম্প্রসারিত সংস্করণটি সম্পর্কে মতামত জানিয়েছেন। সে কাজে তাঁদের আরও বেশি সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে হয়েছে। সেজন্য তাঁদের আরও বেশি করে ধন্যবাদ।

রোমিলা থাপার
মে দিবস, ২০২৩

১

যে সমাজ থেকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে, সেই বিশেষ সমাজটি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদ বিবিধ আখ্যানের জন্ম দেয়। এই আখ্যানগুলির পরস্পরের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য আছে, কারণ তারা কোনও নির্দিষ্ট ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিতে চায় না। বরং যে জনসম্প্রদায়গুলি সমাজের জাতীয়তাবাদী উদ্যোগটির সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য একটি কুলজির জোগান দেওয়াই এই আখ্যানগুলির উদ্দেশ্য। তাছাড়া এই আখ্যানগুলি সমাজের সামনে একটি কেন্দ্রবিন্দুকে তুলে ধরতে চায়, যে অভিমুখে সমাজ এগিয়ে চলবে। বিবিধ জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন পৃথক পরিচিতিকে তুলে ধরে, আর তার ফলে ভবিষ্যতের যে পূর্বাভাসগুলি উঠে আসে, সেগুলিও আদপেই একরকম নয়। এইভাবে তুলে ধরা কিছু সাধারণীকরণ দাবি করে যে তাদের ভিত্তিটি ঐতিহাসিক, কিন্তু তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ইতিহাসবিদদের যাচাই করে দেখে নিতে হয়। এ জাতীয় সাধারণীকরণগুলির ভিত্তি হিসেবে যদি যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দেয়। বিতর্ক বেধে যায় পেশাদার ইতিহাসবিদদের সঙ্গে তাঁদের, যাঁরা ইতিহাস জানেন বলে দাবি করছেন। যে সাধারণীকরণগুলির উদ্দেশ্য বৃহত্তর সমাজকে উসকে দেওয়া, অনেক সময় যেগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় উদ্ভট অযুক্তির মশলাপাতি, সেসবকে পেশাদার ইতিহাসবিদরা খুব স্বাভাবিক কারণেই উপেক্ষা করে থাকেন। অতীতবিষয়ক যে কোনও আখ্যানকেই তাই বৈধ ইতিহাস বলা চলে না। অতীতকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করার কাজটির ভিত্তি হতে হবে পাথুরে ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ। আর সেসব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্য দিয়ে যে কার্যকারণ পরম্পরাটি গড়ে ওঠে, তাকে যুক্তি ও তর্কসম্মত হতে হবে। পেশাদার ইতিহাসবিদদের মতামতকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা সংবাদমাধ্যমের

মনোযোগ টানার আরেকটি পথ। যাঁরা ইতিহাসবিদ নন, তাঁরা সাধারণত এই পথটিরই আশ্রয় নিয়ে থাকেন—বিশেষ করে যাঁরা প্রচারপ্রার্থী, তাঁরা তো বটেই। এই ভুলভাবে উপস্থাপন করার বিষয়টিকে অবশ্য ইতিহাসবিদরা অজ্ঞানের বাচালতা হিসেবে ধরে নিয়ে অগ্রাহ্যই করে থাকেন। আর তাছাড়া যাঁরা ইতিহাসবিদ নন, তেমন মানুষজনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দাবি করা কার্যত দেয়ালের সঙ্গে আলোচনা করারই শামিল।

আমার এই আলোচনাটির ভূমিকা প্রসঙ্গে বোধহয় প্রবন্ধের শিরোনামটিকে ব্যাখ্যা করা উচিত, কারণ তা না হলে সেটিকে কিঞ্চিৎ প্রহেলিকা বলে মনে হতে পারে। ইতিহাস বলতে এককালে যে বস্তুটিকে বোঝানো হত, এখন আর তা বোঝানো হয় না। অর্থাৎ একগুচ্ছ লিখিত সূত্র থেকে বেশকিছু তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে একটি কালানুক্রমিক আখ্যানে গেঁথে ফেলাকে আজকের দিনে আর ইতিহাস বলা চলে না। যাবতীয় সূত্রের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সচেতন ও সমালোচনাত্মক অনুসন্ধান আজ ইতিহাস লেখার পক্ষে অপরিহার্য। এ কাজটি কীভাবে করা হবে তা একটি পদ্ধতির প্রশ্ন, যেটির সঙ্গে সমস্ত ইতিহাসবিদদের জলচল থাকাটা জরুরি। প্রশিক্ষিত পেশাদার ইতিহাসবিদেরা ভারতের যে ইতিহাস লিখেছেন, তার ভিত্তি একটি স্বীকৃত পদ্ধতি, আর তার বিশ্লেষণ কিন্তু সমাজবিজ্ঞান গবেষণার নির্দিষ্ট ধাপগুলিকে পেরিয়েই সম্ভব।

এই পেশাদার ইতিহাসবিদদের বিরুদ্ধপক্ষ সেই সমস্ত মানুষজন যাঁরা ইতিহাসচর্চার পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত নন এবং যাঁরা অতীত সম্পর্কে নানান আকাশকুসুম কল্পনা করে আনন্দ পেয়ে থাকেন। যে বস্তুটি তাঁরা উপস্থাপিত করেন, তাঁদের বিশ্বাসমতে সেটিই অতীতের চিত্র। এই প্রসঙ্গটি আমাদের সটান নিয়ে যায় আঠারো ও উনিশ শতকে। সেসময়ে ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঘটনাবলির ও তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের আখ্যান। সেই গোটা আখ্যানটিকে কালানুক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হত। সে ইতিহাস ছিল মূলত কোনও একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের সমর্থক এবং মতাদর্শটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক। তাছাড়া এহেন ইতিহাস সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানানসই। তেমন জাতীয়তাবাদকে অনুমোদন জোগানোই তো এ ইতিহাসের উদ্দেশ্য। এ ইতিহাস যে নির্দিষ্ট অতীতটি নির্মাণ করে, তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণের আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না, সে প্রশ্ন এই ইতিহাসের উদ্দেশ্যের নিরিখে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যে জগতে আমরা বাস করি, তার সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান হিসেবে অতীতকে দেখা ও তাকে বুঝতে চাওয়া আদপেই এই ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক প্রয়োজনে অতীতকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা, এমনকি

এনসিইআরটি ও ভারতীয় ইতিহাসের ‘যুক্তিবিধান’

এই বইটির চূড়ান্ত খসড়া তৈরির কাজ যখন সবে শেষ করেছি, তখন জানা গেল যে *এনসিইআরটি (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং)* সরকারি স্কুলে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলি থেকে অনেক অংশ কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার উদ্দেশ্য নাকি কোভিড-১৯ অতিমারির পর স্কুলপড়ুয়াদের পঠনপাঠনের ভারলাঘব। কিন্তু কোন অংশগুলি বাদ দেওয়া হচ্ছে, তা যখন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখলেন, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্যটি মূলত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত। একদিক থেকে ঘটনাটি প্রত্যাশিতই ছিল, তাই আমরা অনেকেই বিশেষ আশ্চর্য হইনি। কিন্তু যেরকম নির্বিকার ভঙ্গিতে ইতিহাসের পাঠক্রমকে কার্যত টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছিল, তা আমাদের অবাক করেছিল। এ উদ্যোগের ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যে পাঠ্যবইটি পড়ে থাকল, তা নেহাতই ছেঁড়া ছেঁড়া, ভোঁতা। সেসময়ে এ প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, লেখাটিকে এ বইয়ের উত্তরকথা হিসেবে জুড়ে দিচ্ছি। তার কারণ ইতিহাসের সংজ্ঞা যেভাবে নির্ধারণ করা হয়, আর যেভাবে তার পাঠ দেওয়া হয়, এ-দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি এখন একদিক থেকে আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি *এনসিইআরটি* প্রকাশিত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ভারতীয় ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলি থেকে বিভিন্ন অংশ ছেঁটে ফেলার দরুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আর সে বিতর্ক থেকে উঠে আসছে অজস্র প্রশ্ন। ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বয়ান ও তথ্যের অংশকে স্রেফ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থারই সৌজন্যে এই বয়ানগুলি বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এই গোটা ঘটনাটির জেরে সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে, সেখানে এ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন আলোচিতও হয়েছে। আমি এই বিতর্কের তিনটি দিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই: পাঠ্যবই বস্তুটি শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন গুরুত্বপূর্ণ? এই পাঠ্যবইগুলিতে এলোমেলোভাবে ভারতীয় ইতিহাসের পূর্ববর্তী কিছু সংস্করণ ঢুকিয়ে দেওয়ারই বা তাৎপর্য কী? আর এই কাজটির আশু উদ্দেশ্য কী?

পাঠ্যবই অন্তত তিন ধরনের ভূমিকা পালন করে। প্রথমত তা কোনও বিষয়কে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় বনিয়াদি তথ্যগুলিকে দু-মলাটের মধ্যে জড়ো করে। আদর্শ অবস্থায় প্রতি এক দশক অন্তরই এই তথ্যগুলির পরিমার্জন ঘটানোর কথা। তবে পরিমার্জন করার অর্থ কিন্তু কাটছাঁট নয়—তা সে কাটছাঁট একটি মাত্র বাক্যেই করা হোক, একটি অনুচ্ছেদেই করা হোক, কিংবা কোনও অধ্যায়ের একটি গোটা পরিচ্ছেদে। পরিমার্জনের অর্থ হল নতুন জ্ঞান বা যুক্তিকে এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন পাঠতালিকাকে পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এই বইগুলিকে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে একটি বিন্যাসে সাজানো হয়—প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য ব্যবহৃত সরল পাঠ্যবই থেকে শুরু হয়ে সেই বিন্যাসের উপরের দিকে থাকে উচ্চতর শ্রেণিগুলির জন্য ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত জটিল ধরনের পাঠ্যবই। এই বিন্যাসটিকে কিন্তু উচ্চতর স্তরে প্রাথমিক স্তরের তথ্যগুলির পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখলে চলবে না। উচ্চতর শ্রেণিগুলিতে বিষয়টি সম্পর্কে বোঝাপড়ার স্তরটিকেই সচেতনভাবে পরিবর্তন করা হয়, আর সংশ্লিষ্ট তথ্যের পরিমার্জন ঘটানো হয়। সুতরাং দুটি ভিন্ন স্তরের ভিন্ন শ্রেণিতে ব্যবহৃত পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয়ত, উন্নত মানের পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে শেখায় ও তাতে উৎসাহ জোগায়। তার ফলে পাঠ্য বিষয়টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। তাই প্রশ্ন করা এবং সম্ভব হলে সে প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো যে কোনও বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটানোর পক্ষে অপরিহার্য। আদর্শ অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার এই প্রবণতাটিকে উৎসাহ জোগানোর কথা। তৃতীয়ত, পাঠ্যবই কোনও বিষয়ের পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকেরও অন্যতম সহায়। তার সাহায্যে শিক্ষক ব্যাখ্যা করেন, বিষয়টি কেন আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশুদের যা পড়ানো হচ্ছে এবং যেভাবে পড়ানো হচ্ছে, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, তারা কী ধরনের নাগরিক হয়ে উঠবে সে প্রশ্নের